তুলি-কলম

রানি পদ্মিনীর কাহিনি

স্বামী চেতনানন্দ

বিধাতা বড়ো খেয়ালি। কাউকে রূপ দেন, কিন্তু গুণ দেন না। আবার কাউকে গুণময় করেন, কিন্তু কুশ্রী রূপ দেন। আমাদের দেশে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ শুধু কাল্পনিক কাহিনি নয়, তা বাস্তব, রূঢ় সত্য। কারও অর্থ আছে বিদ্যা নেই, আবার অনেকের বিদ্যাবুদ্ধি আছে কিন্তু সে দরিদ্র। ফ্রান্সে অনুবাদ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে : তুমি যদি সুন্দরী (beautiful) স্ত্রী চাও, সে বিশ্বস্ত (faithful) হবে না। আর যদি বিশ্বস্ত স্ত্রী চাও, সে সুন্দরী হবে না। তাৎপর্য এই যে, অনুবাদ তখনই সার্থক—সেটি যখন সুন্দর ও বিশ্বস্ত হয়। যাই হোক, আমরা এখন এক রাজপুত নারীর কাহিনি বলব, ভগবান যাঁকে একইসঙ্গে রূপ ও গুণ দিয়ে বিভূষিত করেছিলেন।

আমাদের শাস্ত্রে দেখি বিধাতা নারীর রূপ দিয়ে খেলছেন সৃষ্টি ও ধ্বংসের খেলা। দেবতারা অপ্সরাদের মাধ্যমে মুনিঋষিদের তপস্যা ভঙ্গ করছেন, দৈত্যদের ধ্বংস করছেন। মহাভারতের আদিপর্বে সুন্দ-উপসুন্দ দুই দৈত্যকে বধ করবার জন্য ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে বললেন, ''তুমি এমন এক প্রমদা সৃষ্টি করো যাকে সকলেই কামনা করে।'' বিশ্বকর্মা বিশ্বের সব বস্তুর মনোহর উপাদান সংগ্রহ করে এক অতুলনীয়া রূপবতী নারী সৃষ্টি করলেন। জগতের উত্তম বস্তুগুলির তিল তিল পরিমাণ মিলিত হয়ে সৃষ্ট বলে ব্রহ্মা তার নাম দিলেন তিলোত্তমা। তাকে আদেশ দিলেন সুন্দ-উপসুন্দকে প্রলুব্ধ করতে। তিলোত্তমা যাওয়ার আগে দেবতাদের প্রদক্ষিণ করল। সে যেদিকে যায়, তাকে দেখবার জন্য সেইদিকেই ব্রহ্মার একটি করে মুখ নির্গত হল। এইভাবে তিনি চতুর্মুখ হলেন। ইন্দ্রেরও সহস্র নয়ন হল। শিব স্থির হয়ে রইলেন, সেজন্য তাঁর নাম স্থাণু। তারপর তিলোত্তমা পানোন্মত্ত সুন্দ-উপসুন্দের সামনে উপস্থিত হল। তখন তাকে পাওয়ার জন্য দুই ভাই পরস্পর গদাযুদ্ধ করে নিহত হল। দেবতাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল।

ঈশ্বর তাঁর ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি দিয়ে খেলা করেন। মানুষের রূপ চিরকাল থাকে না, গুণেরও হ্রাসবৃদ্ধি আছে। ভাঙা-গড়া, সুখ-দুঃখ, জন্ম-মৃত্যু—এই নিয়েই তো মনুষ্যজীবন! তবু ক্ষণস্থায়ী জীবনে মানুষ রূপ-গুণের বড়াই করে! তবে ভগবান আমাদের রূপ-গুণ দিয়েছেন কেন?—এর উত্তরে আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন :

''মনে করুন, একটি সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি রয়েছে—তা ঈশ্বরসৃষ্ট। প্রথম দর্শনে উহার যে সৌন্দর্য ফুটে উঠল, উহা ঈশ্বরের বিভূতি। ঈশ্বরের বিভূতি চিত্তকে আকর্ষণ করে, ঈশ্বরকে ধরিয়ে দেবার জন্য। যদি ওই স্ত্রী মূর্তিটি দেখে এপ্রকার চিন্তার উদয় হয় : ''আহা! এই সুন্দর স্ত্রী মূর্তিটি যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কত সুন্দর! স্ত্রী মূর্তিটি ভগবানের মহিমা প্রচার করতে এসেছে আবার তাঁর মহিমা প্রচার করে তাঁতেই ফিরে যাবে, উহাতে আমার অধিকার কি?'' ''এই সুন্দর ফুলটি হাসছে, এটি সুন্দর ভগবানেরই মহিমা প্রচার করতে এসেছে, এটি

রানি পদ্মিনীর প্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ

ভগবানের চরণে অর্পিত হতে চায়, আমি উহাতে লোভ করি কেন?" এরকম দৃষ্টিভঙ্গিকে শাস্ত্র বলেন যজ্ঞ—sacrifice, সবকিছু দেবতার উদ্দেশে।

কিন্তু ওইরূপ চিন্তার উদয় না হয়ে যদি ওই স্ত্রীমূর্তিটি বা ফুলটি ভোগের জন্য মন লালায়িত হয়, তবে অহংকাররূপ অসুর ও তার চরদের দ্বারা যজ্ঞ নষ্ট হবে। প্রত্যেক কর্মই ভাবনার গুণে যজ্ঞরূপে পরিণত হয় এবং ভাবনার দোষে আসক্তি নিয়ে আসে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি অসুররা সর্বদা যজ্ঞের বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে। দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি কীভাবে রাজপুত রূপসী পদ্মিনীর জীবন ধ্বংস করেছিল তা ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস টড তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে লিখেছেন।

১৮৯৮ সালে কাশ্মীরভ্রমণকালে স্বামীজী নিবেদিতা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য মহিলাদের কাছে ভারতের রাজপুত নারীদের রূপগুণ, সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দেশাত্মবোধ ও সতীত্বের গল্প বলেছিলেন। স্বামীজী যখন এইসব বীরাঙ্গনাদের তেজস্বিতা ও আত্মমর্যাদার কথা বলতেন তখন তাঁর বুক ফুলে উঠত। চোখেমুখে খেলত বিদ্যুৎ। মনে হত যেন ভাষা তাঁর ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম।

১৯৭৭ সালে অমরনাথ দর্শনের পর ১৯ জুলাই আমি শ্রীনগরের নারায়ণ মঠে যাই। সেখানকার অধ্যক্ষ স্বামী সুখানন্দজী মহারাজ আমাকে সাদরে আশ্রম দেখালেন এবং পিছনে দুটি সিকামোর গাছ দেখিয়ে বললেন যে ওই গাছের নিচে স্বামীজী ও তাঁর গুরু ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী নানা বিষয়ে আলাপ করেছিলেন। স্বামীজী কাশ্মীরে একটা মঠ প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মহারাজ আমাকে লাইব্রেরি দেখালেন। সেখানে বসুমতীর ১৯০৭ সালে প্রকাশিত, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত টডের সচিত্র রাজস্থান বইখানি দেখলাম। ইতিহাসের প্রতি আমার অনুরাগ জেনে সুখানন্দজী গ্রন্থখানি আমায় দিলেন।

লেফটেন্যান্ট কর্নেল জেমস টড (১৭৮২-১৮৩৫) সৈনিক হিসেবে ভারতে আসেন। ১৮১৮ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাঁকে রাজপুতানায় political agent করে পাঠায়। রাজপুতদের বীরগাথা সৈনিক টডকে ঐতিহাসিকে রূপান্তরিত করে। তিনি ১৮২৯ ও ১৮৩২ সালে দুটি খণ্ডে 'Annals & Antiquities of Rajasthan' প্রকাশ করেন।

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখেছেন : ''টড সাহেব আমাদের বৈদেশিক বন্ধু। টডের 'রাজস্থান' আমাদের বিজয়নিশান। উহা ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ব-গৃহের এক বহুমূল্য রত্ন—বহুমূল্য মাণিক্য—অমূল্য কোহিনুর। 'রাজস্থানে'র সংকলনে ও প্রচারণে তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়। বিবিধ শিলালিপি, তাম্রফলক, লৌহফলক, জয়স্তম্ভ, কীর্তিস্তম্ভ, স্মৃতিস্তম্ভ, নানাবিষয়িণী বংশতালিকা প্রভৃতি থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন।"

টডের গ্রন্থ অনুসারে পদ্মিনীর কাহিনি এইরকম : সেসময় বিজাতীয় আক্রমণে ভারতের বহু মূল্যবান

প্রাকৃতিক সম্পদ নষ্ট হয়েছিল। বিদেশিরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশের মহামূল্য ধনসম্পদ লুণ্ঠন করে এবং নানাভাবে অত্যাচার করে সেগুলিকে বিধ্বস্ত করছিল। কিন্তু তারই মধ্যে চিতোরের সমৃদ্ধি ও গৌরব বহুদিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

সময়টা ১২৭৫ খ্রিস্টাব্দ। অপ্রাপ্তবয়স্ক রানা লক্ষ্মণসিংহ চিতোরের সিংহাসনে অভিষিক্ত হলেন। তিনি নাবালক, তাই তাঁর পিতৃব্য ভীমসিংহ রাজকার্য পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব নিলেন। সিংহলদ্বীপবাসী চোহানবংশীয় হামিরশঙ্কের কন্যা পদ্মিনীর সঙ্গে ভীমসিংহের বিয়ে হয়েছিল। পদ্মিনী ছিলেন সর্বাঙ্গসুন্দরী, ললামভূতা রাজকুমারী। তাঁর অসাধারণ সৌন্দর্যের তুলনা ভারতের আর কোথাও একটিও দেখা যেত না। তাঁকে পদ্মালয়া দেবী লক্ষ্মী বললেও অত্যুক্তি হত না। শুধু রূপেই নয়, গুণেও পদ্মিনী ছিলেন অসামান্যা। এখনও পর্যন্ত রাজস্থানের কবিদের বর্ণনার প্রধান উপজীব্য তাঁর গুণগরিমা। যাই হোক, সুন্দরী, সতী, বুদ্ধিমতী রাজলক্ষ্মীর উপস্থিতিতে চিতোরের সর্বত্র সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য ও শান্তি বিরাজ করছিল।

কিন্তু চরম দুর্ভাগ্যবশত অচিরেই এই মনোরম দৃশ্যপট রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। দুর্ধর্ষ নররাক্ষস পাঠানসম্রাট আলাউদ্দিন খিলজি কালস্বরূপ হয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলেন। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর কুদৃষ্টি গিয়ে পড়ল সুন্দর সমৃদ্ধ চিতোর প্রদেশের ওপর। অবশ্য চিতোর জয়ের বাসনা আলাউদ্দীনের তত ছিল না। পদ্মিনীর অলোকসামান্য রূপের কথা শুনেই তাঁর চিত্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। পদ্মিনীলাভের আশায় তিনি চিতোর নগর আক্রমণ করলেন এবং বহুদিন পর্যন্ত নগর অবরোধ করে রাখলেন। অবশ্য তাতে ফল কিছুই হল না। তখন তিনি প্রচার করে দিলেন, পদ্মিনীকে পেলেই তিনি ভারত ছেড়ে চলে যাবেন।

কিন্তু বীরহৃদয় রাজপুতরা একথা শুনে সকলেই প্রতিজ্ঞা করলেন, একজনেরও জীবন থাকতে চিতোরের রানিকে তাঁরা যবনের হাতে সমর্পণ করবেন না। অতএব আলাউদ্দিনের অভিসন্ধি ব্যর্থ হল। কিন্তু তাই বলে তিনি পদ্মিনীকে পাওয়ার লোভ ছাড়লেন না। বললেন, একবারমাত্র মুকুরে সেই ভুবনমোহিনীর প্রতিবিম্ব দেখতে পেলেই তিনি স্বদেশে ফিরে যাবেন।

সকলের পরামর্শে ভীমসিংহ এ-প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন। রাজপুতদের কাছে তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতির মূল্য অসীম। জীবন বিসর্জন দিয়েও সে-প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষা করে। এমনকী ভয়ংকর আততায়ীও যদি একজন রাজপুতের অতিথি হয়, তাকে সে উপযুক্ত সম্মান দেয়। আলাউদ্দিনের এটা জানা ছিল। তাই সামান্য কয়েকজন রক্ষীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নির্ভয়ে অসংখ্য সৈন্যপরিবেষ্টিত রাজপুতশিবিরে পৌঁছলেন। তাঁকে যথোচিত মর্যাদা ও সংবর্ধনা সহকারে আপ্যায়িত করা হল। সসম্মানে অতিথিসৎকার সমাপ্ত করে ভীমসিংহ আলাউদ্দিনকে দর্পণের মাধ্যমে পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখালেন। আলাউদ্দিন নিজের অপরাধের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিয়ে নিজের শিবিরের দিকে যাত্রা করলেন। সরলপ্রাণ ভীমসিংহ দুর্গের পাদদেশ পর্যন্ত তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন।

শত ধুলেও কয়লার মলিনতা দূর হয় না। ধর্মের শত শত উপদেশ শুনলেও, এমনকী সত্যরক্ষার প্রত্যক্ষ উদাহরণ চোখের সামনে দেখলেও পাপমনের পাপপ্রবৃত্তি ঘোচে না। তাই বিশ্বাসঘাতক আলাউদ্দিন প্রতারণার সাহায্য নিলেন। যখন ভীমসিংহ আলাউদ্দিনের সঙ্গে সামনে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ একদল অস্ত্রধারী পাঠান সেনা লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসে ভীমসিংহকে বন্দি করে ফেলল। যবনসম্রাট আদেশ দিলেন—পদ্মিনীকে পেলেই ভীমসিংহের মুক্তি হবে।

রাতারাতি এই অশুভসংবাদ চিতোরে পৌঁছে গেল। নগরবাসী বীরদের মুখ ম্লান হয়ে গেল। কেমন করে ভীমসিংহকে তাঁরা উদ্ধার করবেন, অথবা কেমন করেই বা এই ঘৃণ্য প্রস্তাব পদ্মিনীর কাছে উত্থাপন করবেন, তা কেউই ঠিক করে উঠতে পারলেন না। সকলেই দুশ্চিন্তায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন।

এদিকে লোক মারফত সব খবরই পদ্মিনীর কানে পৌঁছল। অনেক চিন্তাভাবনার শেষে তিনি জানালেন, তিনি স্বামীর উদ্ধারের জন্য নিজে পাঠানশিবিরে যেতে প্রস্তুত। তাঁর এই সিদ্ধান্ত শুনে সকলে বিস্ময়ে চমকে

উঠল। পদ্মিনী এক নিভৃত কক্ষে তাঁর দুই বিশ্বস্ত সঙ্গী পিতৃব্য দোরা ও বারো বছরের ভ্রাতুষ্পুত্র বাদলের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণায় বসলেন। বহুক্ষণ ধরে পরামর্শ করার পর পদ্মিনী নিজের কর্তব্য স্থির করলেন এবং আলাউদ্দিনের কাছে এই মর্মে সংবাদ পাঠালেন যে, তিনি যেহেতু রানি, তাই উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে তিনি পাঠানদের কাছে যেতে চান। একান্ত অনুগতা সহচরীরা এবং তাঁর প্রতি স্নেহশীলা পুরনারীরা তাঁর সঙ্গে পাঠানশিবির পর্যন্ত যাবেন। রানি শিবিরে পৌঁছলে সঙ্গিনীরা সকলে চিতোরে ফিরে যাবেন। তাঁদের সম্মানরক্ষায় যেন কোনও ত্রুটি না হয়। তাছাড়া শেষবিদায় নেওয়ার জন্য রানা ভীমসিংহের সঙ্গে রানি পদ্মিনীকে একবার দেখা করতে দিতে হবে। এইসব শর্ত মেনে যেদিন সম্রাট অবরোধকারী সৈন্যদের উঠিয়ে নিয়ে কিছু দূরে গিয়ে শিবির স্থাপন করবেন, সেদিনই পদ্মিনী প্রতিশ্রুতিমতো তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হবেন।

রানি পদ্মিনীর একটি কল্পিত চিত্র

আলাউদ্দিন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অবরোধ তুলে নেবার দিন ঠিক করে ফেললেন। নির্দিষ্ট দিনে সাতশোটি পর্দাবেষ্টিত শিবিকা চিতোর থেকে পাঠানশিবিরের দিকে যাত্রা করল। প্রত্যেক শিবিকার ভিতরে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এক-একজন মহাবীর রাজপুত যোদ্ধা লুকিয়ে রইলেন। আবার প্রত্যেকটি শিবিকাকে বয়ে নিয়ে চলল গুপ্ত অস্ত্রধারী ছদ্মবেশী ছজন করে যোদ্ধা। অবশেষে সাতশো শিবিকা পাঠানশিবিরে গিয়ে উপস্থিত হল। প্রিয়তমা পত্নী পদ্মিনীর সঙ্গে শেষবারের মতো একবার সাক্ষাৎ করার জন্য আলাউদ্দিন ভীমসিংহকে মাত্র আধঘণ্টা সময় দিয়েছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে ভীমসিংহ যেই শিবিকার কাছে গেলেন অমনি তাঁর কয়েকজন সৈন্য তাঁকে একটি শিবিকায় তুলে নিয়ে চিতোরের দিকে রওনা হল। তাঁর অনুগমন করল আরও কয়েকটি শিবিকা। দেখে আলাউদ্দিন ভাবলেন, পদ্মিনীর কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চিতোরের কুলললনারা ফিরে যাচ্ছেন।

দেখতে দেখতে আধঘণ্টা পার হয়ে গেল। কিন্তু স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ সেরে ভীমসিংহ ফিরছেন না। আলাউদ্দিন সন্দিহান হয়ে শিবিকার পর্দাগুলি সরাতে আদেশ দিলেন। পর্দা সরানো হল। আলাউদ্দিন চমকে উঠলেন। শিবিকায় ভীমসিংহও নেই, পদ্মিনীও নেই। ক্রোধে তিনি দিশেহারা হয়ে গেলেন। আর তখনই সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধারা বীরবিক্রমে তরোয়াল হাতে শিবিকার ভিতর থেকে বার হতে লাগলেন। ঘোরতর যুদ্ধ বেধে গেল।

পলাতক ভীমসিংহকে ধরার জন্য একদল সেনাকে পাঠানো হল। রাজপুতসেনাদের সঙ্গে তাদের তুমুল যুদ্ধ শুরু হল। শিবিকা থেকে কোনওক্রমে নেমে ভীমসিংহ ঘোড়ায় চড়ে দ্রুত চিতোরদুর্গে প্রবেশ করলেন। পাঠানেরা সেই দুর্গদ্বার পর্যন্ত তাঁকে ধাওয়া করেছিল। এদিকে গোরা বীরবিক্রমে যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। পরে তাঁর পত্নী তাঁর বীরত্বের কথা শুনতে চাইলে বাদল বলেছিলেন, ‘‘সেকথা কী করে

বলব? তাঁর সঙ্গে যাদের যুদ্ধ হয়েছে, একমাত্র তারাই তাঁর বীরত্বের কথা বলতে পারে, কিন্তু তারা একজনও তো বেঁচে নেই!" ব্যর্থ আলাউদ্দিন চিতোর ত্যাগ করে চলে যান।

কিন্তু দুর্বৃত্ত আলাউদ্দিনের কামনার তৃপ্তি নেই। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে (কারও মতে ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে) তিনি আবার চিতোর আক্রমণ করলেন। চিতোরের দক্ষিণ দিকের পার্বত্য অঞ্চলে জঙ্গল পরিষ্কার করে, পরিখা খনন করে পাঠানশিবির স্থাপিত হল। উভয়পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হল। আগের যুদ্ধেই বহু রাজপুত বীরের প্রাণনাশ হয়েছিল। এবার দীর্ঘকাল ধরে যুদ্ধ চলল এবং একে একে বহু বীর যোদ্ধা প্রাণ বিসর্জন দিলেন।

শোনা যায়, এসময় এক রাতে চিন্তামগ্ন রানা ভীমসিংহ হঠাৎ একটি স্বর শুনতে পান : ম্যায় ভুখা হুঁ। মুখ তুলে চিরাগের মৃদু আলোয় চিতোরের রাজলক্ষ্মীর দর্শন পেলেন তিনি। ''আটহাজার রাজপুত বীরকে বলিরূপে গ্রহণ করেও কি আপনার তৃপ্তি হয়নি, দেবী?" রানার কাতর প্রশ্নের উত্তরে দেবী বললেন, ''আমি রাজরক্ত চাই। বারোজন রাজাকে যদি বলি না পাই, তাহলে চিতোর ধ্বংস হয়ে যাবে।"

রানা ভীমসিংহের বারোজন পুত্র ছিলেন। ওই ঘটনার পর স্থির হয় যে, যুবরাজরা প্রত্যেকে তিনদিন করে রাজা হবেন এবং চতুর্থ দিনে যুদ্ধে যাবেন। প্রিয়পুত্র অজয়সিংহকে ভীমসিংহ বহু কষ্টে চিতোর ত্যাগে রাজি করালেন। তিনি বিশ্বস্ত কিছু সৈন্য সহ রাতের অন্ধকারে শত্রুশিবির পার হয়ে চিতোর ছেড়ে চলে গেলেন।

শত্রুর হাত থেকে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য রাজপুত নারীরা জ্বলন্ত আগুনে প্রাণবিসর্জন দিতেন, যাকে বলা হত জহরব্রত। যখন শত্রুর হাত থেকে বাঁচার আর কোনও উপায় থাকত না তখন এই ব্রত উদ্‌যাপন করা হত। এখনও সেইরকম কঠিন পরিস্থিতি সমাগত দেখে রানা ওই কঠোর ব্রতের আয়োজন করলেন। রাজপুরীর অন্তঃপুরে, সূর্যের আলোও প্রবেশ করে না এমন একটি স্থানে এক বিশাল কূপ ছিল। ওই কূপে সর্বদা আগুন জ্বলত। পতিপুত্রহীনা হাজার হাজার রাজপুত রমণী সেই অগ্নিকুণ্ডে জীবন বিসর্জন দেবার সংকল্প নিয়ে বিশাল কূপের সামনে উপস্থিত হলেন। পদ্মিনী তাঁদের পুরোবর্তিনী। সকলে অন্ধকারাচ্ছন্ন সুড়ঙ্গপথ দিয়ে গহ্বরে নেমে গেলেন এবং বিশাল গহ্বরের বিরাট লোহার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

আহা! সেই অন্ধকূপের মধ্যে কী ভয়ংকর পরিস্থিতি তখন তৈরি হল তা ভাবতেও হৃদয় কেঁপে ওঠে! চিতোরের কুললক্ষ্মীরা চিরবিদায় নিলেন। সতীশিরোমণি পদ্মিনী করাল গহ্বরের মধ্যে জ্বলন্ত অনলে দেহত্যাগ করলেন। তখন থেকেই ওই কূপ পবিত্র বলে পরিচিতি লাভ করেছে। প্রচলিত বিশ্বাস, আজও এক বিশাল অজগর ওই গহ্বর রক্ষা করছে। কেউ প্রদীপ হাতে ওই গহ্বরে প্রবেশের উপক্রম করলে কালসাপের বিষময় নিঃশ্বাসে দীপ নিভে যায়।

যাই হোক, ওই ঘটনার পর নিশ্চিন্ত হয়ে ভীমসিংহ তাঁর অবশিষ্ট পরিজনদের সঙ্গে যুদ্ধে আত্মবলি দিলেন। আলাউদ্দিন ও তাঁর সেনাদল জনমানবহীন চিতোরে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন শুধু ধোঁয়ার কুণ্ডলী।

কথায় বলে—'পুড়বে নারী উড়বে ছাই, তবে তার কলঙ্ক নাই।' নিষ্কলঙ্ক পদ্মিনী তাঁর রূপযৌবন, দেহপ্রাণ অগ্নিতে আহুতি দিয়ে সতীত্ব রক্ষা করলেন। সতীত্ব জাতির মেরুদণ্ড। সতীত্ব যে কী মূল্যবান, তা মানুষ সতীত্ব হারিয়ে বোঝে। ভারতীয় মহীয়সী নারীদের সতীত্বের কাহিনি ভারতের মেয়েদের মধ্যে অপূর্ব সতীত্ববুদ্ধি সঞ্চার করে আমাদের গৃহস্থালী পবিত্র করে রেখেছে। পবিত্র পরিবারেই সুখশান্তি সদা বিরাজিত।

ইতির পরে থাকে পুনশ্চ। বিশ্বাসঘাতক, নরপিশাচ, কামুক আলাউদ্দিনের কী হল? এ-কৌতূহল পাঠকমনে ওঠা স্বাভাবিক। কৃতকর্মের ফল এড়াবার উপায় নেই। সেনাপতি কাফুর তাঁকে বিষপ্রয়োগ করে হত্যা করে। একেই বলে প্রকৃতির প্রতিশোধ। আলাউদ্দিনকে মানুষ ভুলে গেছে কিন্তু রাজপুতানার ভাটেরা আজও 'রাজপুতজননী' বলে পদ্মিনীকে বিশেষিত করে তাঁর কীর্তিগাথা কীর্তন করে চলেছে।